মীমাংসা দিয়ে বলেছেন ঃ এটা মোটেই অবান্তর নয় যে, আত্মাসমূহের আসল স্থান ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনই। কিন্তু এসব আত্মার একটি বিশেষ যোগসূত্র কবরের সাথেও কায়েম রয়েছে। এই যোগসূত্র কিরূপ, তার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিরণ পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকোজ্জ্বল করে দেয় এবং উত্তপ্তও করে, তেমনিভাবে ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনস্থ আত্মাসমূহের কোন অদৃশ্য যোগসূত্র কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মীমাংসার ব্যাপারে কাযী সানাউল্লাহ্ (র)-র সুচিন্তিত বক্তব্য সূরা নাযিয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, রূহ্ দুই প্রকার—১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এটা বস্তুনিষ্ঠ এবং চারি উপাদানে গঠিত দেহ, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই নফস বলা হয়। ২. অবস্তুনিষ্ঠ অশরীরী রূহ্। এই রূহ্ই নফসের জীবন। কাজেই একে রূহের রূহ্ বলা যায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রূহের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার রূহ্ অর্থাৎ নফ্স মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় রূহ্ প্রথম রূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। মৃত্যুর পর প্রথম রূহ্কে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কবরই এর স্থান। আযাব ও সওয়াব এর উপরই চলে এবং দ্বিতীয় প্রকার অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, অশরীরী আত্মাসমূহ জান্নাতে অথবা ইল্লিয়্যীনে, জাহান্নামে অথবা সিজ্জীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রূহ্ তথা সূক্ষ্ম শরীরী নফ্স কবরে থাকে।

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ — تنافس-এর অর্থ কোন বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য কয়েকজনের ধাবিত হওয়ার ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখানে জান্নাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন ঃ আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায়রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামত। এসব নিয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নিয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন ঃ

یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں ، جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا
کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم ، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ — এই আয়াতে

আল্লাহ্ তা'আলা সত্যপন্থীদের সাথে মিথ্যাপন্থীদের ব্যবহারের পূর্ণ চিত্র অংকন করেছেন। কাফিররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাসত, তাদেরকে সামনে দেখলে চোখ টিপে ইশারা করত। এরপর তারা যখন নিজেদের বাড়ীঘরে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস করার বিষয়ে আনন্দভরে আলোচনা করত। কাফিররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহ্যত সহানুভূতির সুরে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলত ঃ এ বেচারীরা বড় সরলমনা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

আজকালকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যারা নব্যশিক্ষার অশুভ ফলস্বরূপ ধর্ম ও পরকালের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি নামেমাত্রই বিশ্বাসী রয়ে গেছে, তারা আলিম ও ধর্মপরায়ণ লোকদের সাথে হুবহু এমনি ধরনের ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মর্মন্তুদ আযাব থেকে রক্ষা করুন। এই আয়াতে মু'মিন ও ধার্মিক লোকদের জন্য সান্ত্বনার যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। তাদের উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদের উপহাসের পরোয়া না করা। জনৈক কবি বলেন ঃ

ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے + زمانہ ہم پر ہنستا ہی رہے گا

سورة الانشقاق

সূরা ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝٣
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٥ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ
كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۝٦ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۝٧
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝٩ وَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝١١ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢ إِنَّهُ
كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝١٣ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۝١٤ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ
بِهِ بَصِيرًا ۝١٥ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝١٦ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝١٧ وَالْقَمَرِ إِذَا
اتَّسَقَ ۝١٨ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝١٩ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٢٠ وَإِذَا قُرِئَ
عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝٢١ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ۝٢٢ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝٢٣ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٢٤ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٢٥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার

পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে, (১১) সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (১৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না। (২২) বরং কাফিররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন (দ্বিতীয় ফুঁকের সময়) আকাশ বিদীর্ণ হবে (তাতে মেঘমালার ন্যায় ফেরেশতা-বাহী এক বস্তু অবতীর্ণ হয়। يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ আয়াতে এর উল্লেখ আছে)। এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ বিদীর্ণ হওয়ার সৃষ্টিগত আদেশ পালন করার অর্থ, তা ঘটা)। এবং আকাশ (আল্লাহ্র কুদরতের অধীন হওয়ার কারণে) এরই উপযুক্ত (যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তা অবশ্যই হবে) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (যেমন চামড়া অথবা রবারকে সম্প্রসারিত করা হয়। ফলে পৃথিবীর পরিধি বর্তমানের চেয়ে অনেক বেড়ে যাবে, যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের তাতে স্থান সংকুলান হয়; দুররে মনসূরে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ تمد الارض يوم القيامة مد الاديم সুতরাং আকাশের বিদীর্ণ হওয়া এবং পৃথিবীর সম্প্রসারণ উভয়টি হাশরের হিসাব-নিকাশের অন্যতম ভূমিকা)। এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত বস্তুসমূহকে (অর্থাৎ মৃতদেরকে) বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং (সমস্ত মৃত থেকে) খালি হয়ে যাবে এবং সে (অর্থাৎ পৃথিবী) তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং সে এরই উপযুক্ত। (এর তফসীর পূর্বের ন্যায়। তখন মানুষ তার কৃতকর্ম-সমূহ দেখবে; যেমন ইরশাদ হয়েছে ঃ) হে মানুষ, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট পৌঁছা পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত) চেষ্টা করে যাচ্ছ (অর্থাৎ কেউ সৎ কাজে এবং কেউ অসৎ কাজে নিয়োজিত রয়েছে), অতঃপর (কিয়ামতে) সেই চেষ্টার (প্রতিফলের) সাথে সাক্ষাৎ ঘটবে। (তখন) যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে, তার কাছ থেকে

সহজ হিসাব নেওয়া হবে এবং সে (হিসাব শেষে) তার পরিবার-পরিজনের কাছে হাষ্ট-চিত্তে ফিরে যাবে। (সহজ হিসাবের স্তর বিভিন্ন রূপ—এক. হিসাবের ফলে মোটেই আযাব হবে না। তারা কোনরূপ আযাব ব্যতিরেকেই মুক্তি পাবে। এবং দুই. হিসাবের ফলে চিরস্থায়ী আযাব হবে না। এটা সাধারণ মু'মিনদের জন্য হবে। এক্ষেত্রে অস্থায়ী আযাব হতে পারে। পক্ষান্তরে) যার আমলনামা (তার বাম হাতে) পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেওয়া হবে [অর্থাৎ কাফির। সে হয় আল্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থাকবে, ফলে বাম হাত পশ্চাতে থাকবে; না হয় মুজাহিদের উক্তি অনুযায়ী তার বাম হাত পৃষ্ঠদেশে করে দেওয়া হবে।—(দুররে-মনসূর], সে মৃত্যুকে আহ্‌বান করবে (যেমন, বিপদে মৃত্যু কামনা করার অভ্যাস মানুষের আছে) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে (দুনিয়াতে) তার পরিবার-পরিজনের (ও চাকর-নকরের) মধ্যে আনন্দিত ছিল (এমনকি, আনন্দের আতিশয্যে পরকালকেও মিথ্যা মনে করত) সে মনে করত যে, সে কখনও (আল্লাহ্‌র কাছে) ফিরে যাবে না। (অতঃপর এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে) কেন ফিরে যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে সম্যক দেখতেন (এবং তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়ার ইচ্ছা করে রেখেছিলেন। তাই এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল)। অতএব, আমি শপথ করছি, সন্ধ্যাকালীন লাল আভার এবং রাত্রির এবং রাত্রি যা নিজের মধ্যে ধারণ করে তার (অর্থাৎ সেসব প্রাণীর, যারা বিশ্রামের জন্য রাত্রিতে নিজ নিজ ঠিকানায় ফিরে আসে) এবং চন্দ্রের যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে (অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র হয়ে যায়, এসব জিনিসের শপথ করে বলছি) তোমাদেরকে অবশ্যই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পৌঁছাতে হবে। এটা يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ থেকে مُلَاقِيهِ পর্যন্ত বর্ণিত সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ। এসব অবস্থা হচ্ছে মৃত্যুর অবস্থা, বরযখের অবস্থা, কিয়ামতের অবস্থা। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে একাধিক অবস্থা আছে। শপথের সাথে এগুলোর মিল এই যে, রাত্রির অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়। প্রথমে পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা যায়, এরপর রাত্রি গভীর হলে সব নিদ্রিত হয়ে যায়। চন্দ্রালোকের আধিক্য এবং স্বল্পতায়ও এক রাত্রি অন্য রাত্রি থেকে ভিন্ন রূপ হয়। এগুলো সব মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন অবস্থার অনুরূপ। এছাড়া মৃত্যু পরকালের সূচনা, যেন সন্ধ্যাকালীন লাল আভা রাত্রির সূচনা। অতঃপর বরযখের অবস্থান মানুষের নিদ্রিত থাকার অনুরূপ এবং ক্ষয়-প্রাপ্তির পর চন্দ্রের পূর্ণ রূপ লাভ করা সবকিছু ধ্বংসের পর কিয়ামতের পুনরুজ্জীবন লাভ করার সাথে সামঞ্জস্যশীল)। অতএব (ভীত হওয়ার ও ঈমান আনার এসব কারণ থাকা সত্ত্বেও) মানুষের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না? (তাদের হঠকারিতা এতদূর যে) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্‌র কাছে নত হয় না বরং (নত হওয়ার পরিবর্তে) কাফিররা (উল্টো) মিথ্যারোপ করে। তারা যা (অর্থাৎ কুকর্মের ভাণ্ডার) সংরক্ষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ জানেন। অতএব (এসব কুফরী কর্মের কারণে) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিয়ে দিন। কিন্তু যারা ঈমান

আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার, (সৎ কর্ম শর্ত নয়---কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফিল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তদ্দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা----পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে। অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কিয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ — اذنت-এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। حقت-এর অর্থ حق لها الانقياد অর্থাৎ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ দুই প্রকার : এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দু' অর্থ হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্‌র নির্দেশ দুই প্রকার---১. শরীয়ত-গত নির্দেশ ; এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতি-পক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে স্বেচ্ছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে ; যেমন মানব ও জিন। এই শ্রেণীর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফির এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তকদীরগত নির্দেশ ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই যে, চুল পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে ; জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন, কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذرہ ذرہ دہر کا پابستۂ تقدیر ہے
زندگی کے خواب کی جامی یہی تقدیر ہے

এস্থলে এটা সম্ভবপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসামাত্রই তারা স্বেচ্ছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে

সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হয়, যাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোন দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর। তবে وَحُقَّتْ لِرَبِّهَا وَأَذِنَتْ—এর ভাষা প্রথমোক্ত অর্থের অধিক নিকটবর্তী। দ্বিতীয় অর্থ ও রূপক হিসাবে হতে পারে।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ—مد—এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে।—(মাযহারী)

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ—অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগীরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ—كدح—এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। إِلَىٰ رَبِّكَ—অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহ্র দিকে চূড়ান্ত হবে।

আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাফির-মু'মিন নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগতভাবে কোন না কোন বিষয়কে লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে অভ্যস্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এবং তাতে স্বীয় শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে, তেমনি দুষ্কর্মী ও অসৎ ব্যক্তিও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেখুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক শ্রম স্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনযিল, যা সে অজ্ঞাতসারেই

অব্যাহত রেখেছে। এই সফরের শেষ সীমা আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিতি অর্থাৎ মৃত্যু। الى ربك বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে। এই শেষ সীমা এমন একটি অকাট্য সত্য, যা অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষ হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাবনিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎ ও অসতের পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে জানা যায়। নতুবা ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। একজন সৎ লোক একমাস মেহনত-মজুরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যোগাড় করে, চোর ও ডাকাত তা এক রাত্রিতে অর্জন করে ফেলে। যদি হিসাবে কোন সময় না আসে এবং প্রতিদান ও শাস্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সৎ লোক এক পর্যায়ে চলে যাবে, যা বিবেক ও ইনসাফের পরিপন্থী। অবশেষে বলা হয়েছেঃ فَمُلٰقِيْهِ—এর সর্বনাম দ্বারা كدح ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা رب -ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্য তার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর সৎ ও অসৎ এবং মু'মিন ও কাফির মানুষের আলাদা আলাদা পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। ডান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। ডান হাতওয়ালারা জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বাম হাতওয়ালারা জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ পেয়ে যাবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বস্তুও সৎ-অসৎ উভয় প্রকার লোকই অর্জন করে। এভাবে পার্থিব জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিণতি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিণতি অনন্ত আযাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিণতির কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিধারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দেয় না। যাতে দুনিয়াতেও তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয়?

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا—এতে মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ من حوسب يوم القيامة عذاب—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্ন করলেনঃ কোরআনে কি يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا বলা হয়নি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেনঃ এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।—(বুখারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মু'মিনদের কাজকর্মও সব আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হাষ্টচিত্তে ফিরে আসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. পরিবার-পরিজনের অর্থ জান্নাতের হুরগণ। তারাই সেখানে মু'মিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই. দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসাবের পর যখন মু'মিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী সাফল্যের সুসংবাদ শুনানোর জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তফসীরকারকগণ উভয় অর্থ বর্ণনা করেছেন। —(কুরতুবী)

اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا—অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পার্থিব জীবনে কখনও নিশ্চিন্ত হয় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কোরআন পাক তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেঃ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ—অর্থাৎ আমরা পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উভয় দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। যারা দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অতিবাহিত করত, আজ তাদের ভাগ্যে জাহান্নামের আযাব এসেছে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আযাবের ভয় রাখত, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও খুশী অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখে মত্ত ও বিভোর হয়ে যাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোন সময় কোন অবস্থাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় না।

فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ—এখানে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শপথের চারটি বস্তু এই বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে شفق-এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই লাল আভা, যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়। এটা রাত্রির সূচনা, যা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময় আলো বিদায় নেয় এবং অন্ধকারের সয়লাব চলে আসে। এরপর স্বয়ং রাত্রির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগুলোকে রাত্রির অন্ধকার নিজের মধ্যে একত্র করে। وسق-এর আসল অর্থ একত্র করা। এর ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে এতে জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অর্থও হতে পারে যে, যেসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলায় সেগুলো জড়ো হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্তু নিজ নিজ গৃহে ও বাসায় একত্রিত হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপত্র গুটিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন স্বয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে।

চতুর্থ শপথ হচ্ছে ঃ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ এটাও وسق থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্র করা। চন্দ্রের একত্র করার অর্থ তার আলোকে একত্র করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طبق বলা হয়। ركوب—এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে অগণিত পরিবর্তন, অব্যাহত সফর এবং তার চূড়ান্ত মনযিল ঃ সে বীর্য থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর গোশ্তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর তাতে অস্থি সৃষ্টি হয়েছে, অস্থির উপর গোশ্ত হয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রূহ্ স্থাপন

করার ফলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গর্ভাশয়ের পচা রক্ত। নয় মাস পরে আল্লাহ্ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পচা রক্তের বদলে মায়ের দুধ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে গেল। দু'বছরের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা-সহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মায়ের দুধ ছাড়া পেয়ে আরও অধিক সুস্বাদু ও রকমারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক তার দিবারাত্রির একমাত্র কাজ হয়ে গেল। যখন কিছু জ্ঞান ও চেতনা বাড়ল তখন শিক্ষাদীক্ষার যাঁতাকলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবন-সুলভ কামনা-বাসনা তার স্থান দখল করে বসল এবং এক রোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এল। বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মব্যস্ততায় দিবারাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটল। আঙ্গিক শক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনযিল কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্তু অদূরদর্শী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যু ও কবরই তার সর্বশেষ মনযিল। এরপর কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন যে, কবর তোমার সর্বশেষ মনযিল নয় বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজগৎ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনযিল নির্ধারিত হবে, যা হয় চিরস্থায়ী আরাম ও সুখের মনযিল হবে, না হয় অনন্ত আযাব ও বিপদের মনযিল হবে। এই সর্বশেষ মনযিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসস্থল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে إِلَىٰ رَبِّكَ — إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ এবং

كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ—বলে এই বিষয়বস্তুই বর্ণনা করেছে। সে গাফিল মানুষকে এই সর্বশেষ মনযিল সম্পর্কে অবহিত করে হুঁশিয়ার করেছে যে, বয়স হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার সফর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলাফেরায়, নিদ্রা ও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট—সর্বাবস্থায় এই সফরের মনযিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনযিলে অবস্থান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন আরাম, না হয় আযাবই আযাব এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। অতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরী ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্বৃহৎ লক্ষ্য স্থির করা। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل—অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন কোন মুসাফির কয়েক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোন পথিক পথে

চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য থেমে যায়। উপরে বর্ণিত طبقا عن طبق -এর তফসীরের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত আবূ নাঈম (র) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ স্থলে কুরতুবী আবূ নাঈমের এবং ইবনে কাসীর (র) ইবনে আবী হাতেম (র)-এর বরাত দিয়ে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার সৃষ্টি ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উজ্জ্বল নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাফলতি ত্যাগ করে না। তাই শেষে বলা হয়েছে ঃ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ—অর্থাৎ এই গাফিল ও মূর্খ লোকদের কি হল যে, তারা সবকিছু শোনা ও জানার পরও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনে না?

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ—অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হিদায়তে পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহ্র দিকে নত হয় না।

سجود ও سجدة-এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সিজদা উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহ্র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোন বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সিজদার নির্দেশ নেই বরং নির্দেশটি সমগ্র কোরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আয়াতে পারিভাষিক সিজদা অর্থ নেওয়া হলে কোরআনের প্রত্যেক আয়াতে সিজদা করা অপরিহার্য হবে, যা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে কেউ এর প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন থাকে যে, এই আয়াত পাঠ করলে ও শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাহুল্য, কিঞ্চিৎ সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সিজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। কোন কোন হানাফী ফিকাহ্বিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ এখানে القرآن বলে সমগ্র কোরআন বোঝানো হয়নি বরং الف لام عهد ى হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সদর্থই, যাকে সম্ভাবনার পর্যায়ে শুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এটা অবান্তর মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ফয়সালা হাদীস এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা হতে পারে। তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ফলে মুজতাহিদ আলিমগণও বিষয়টিতে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র মতে এই আয়াতেও সিজদা ওয়াজিব। তিনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীসসমূহকে এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন ঃ

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত আবূ রাফে' (রা) বলেন ঃ আমি একদিন ইশার নামায হযরত আবূ হুরায়রার পিছনে পড়লাম। তিনি নামাযে সূরা ইনশিকাক পাঠ

করলেন এবং এই আয়াতে সিজদা করলেন। নামাজান্তে আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এ কেমন সিজদা? তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পশ্চাতে এই আয়াতে সিজদা করেছি। তাই হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা করে যাব। সহীহ্ মুসলিম আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা নবী করীম (সা)-এর সাথে সূরা ইন্‌শিকাক ও সূরা ইকরায় সিজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ এটাই ঠিক যে, এই আয়াতটিও সিজদার আয়াত। যে এই আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা শুনে তার উপর সিজদা ওয়াজিব।—(কুরতুবী) কিন্তু ইবনে আরাবী (র) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সিজদা করার প্রচলন ছিল না। তারা হয়তো এমন ইমামের মুকাল্লিদ (অনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সিজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র) বলেন ঃ আমি যখন কোথাও ইমাম হয়ে নামায পড়াতাম তখন সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ করতাম না। কারণ, আমার মতে এই সূরায় সিজদা ওয়াজিব। কাজেই যদি সিজদা না করি, তবে গোনাহ্‌গার হব। আর যদি করি, তবে গোটা জামাআত আমার এই কাজকে অপছন্দ করবে। কাজেই অহেতুক মতানৈক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।

سورة البروج

সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২২॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣ قُتِلَ
اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَّهُمْ عَلٰى
مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا
بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
شَهِيْدٌ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١٠ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝١١ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢
اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٣ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝١٥
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٦ هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝١٨ بَلِ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ ۝١٩ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝٢٠ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ
مَّجِيْدٌ ۝٢١ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝٢٢

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়, (৪-৫) অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল, (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (৮) তারা

তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু একারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহ্‌র সামনে রয়েছে সব কিছু। (১০) যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামে শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণী-সমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। (১৪) তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) তিনি যা চান, তাই করেন। (১৭) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি, (১৮) ফিরাউনের এবং সামূদের? (১৯) বরং যারা কাফির, তারা মিথ্যারোপে রত আছে। (২০) আল্লাহ্‌ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটা মহান কোরআন, (২২) লওহে মাহ্‌ফুযে লিপিবদ্ধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শানে নুযূল ঃ এই সূরার একটি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্‌ মুসলিমে উল্লিখিত এই কাহিনীর সার-সংক্ষেপ এই যে, জনৈক বাদশাহ্‌র দরবারে একজন অতীন্দ্রিয়বাদী থাকত। (যে ব্যক্তি শয়তানদের সাহায্যে অথবা নক্ষত্রের লক্ষণাদির মাধ্যমে মানুষকে ভবিষ্যতের খবরাদি বলে, তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলা হয়)। সে একদিন বাদশাহ্‌কে বলল ঃ আমাকে একটি চালাক-চতুর বালক দিলে আমি তাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিতাম। সেমতে তার কাছ থেকে এই বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য একটি বালককে মনোনীত করা হল। এই বালকের আসা-যাওয়ার পথে জনৈক খৃস্টান পাদ্রী বসবাস করত। সে যুগে খৃস্টধর্মই ছিল সত্যধর্ম। পাদ্রী অধিকাংশ সময়ই ইবাদতে মশগুল থাকত। বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া করত এবং সে গোপনে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল। একদিন বালকটি দেখল যে, একটি সিংহ পথ আটকে রেখেছে এবং মানুষ সিংহের ভয়ে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করছে। বালকটি এক খণ্ড পাথর হাতে নিয়ে দোয়া করল ঃ হে আল্লাহ্‌, যদি পাদ্রীর ধর্ম সত্য হয়, তবে এই সিংহ আমার প্রস্তরাঘাতে মারা যাক, আর যদি অতীন্দ্রিয়বাদী সত্য হয়, তবে না মরুক। একথা বলে সে পাথর নিক্ষেপ করতেই তা সিংহের গায়ে লাগল এবং সিংহ মারা গেল। এরপর মানুষের মধ্যে একথা ছড়িয়ে পড়ল যে, এই বালক এক আশ্চর্য বিদ্যা জানে। জনৈক অন্ধ একথা শুনে এসে বলল ঃ আমার অন্ধত্ব মোচন করে দিন। বালক বলল ঃ তুমি আল্লাহ্‌র সত্যধর্ম কবূল করলে আমি চেষ্টা করে দেখব। অন্ধ এই শর্ত মেনে নিল। সেমতে বালকটি দোয়া করতেই অন্ধ তার চক্ষু ফিরে পেল এবং সত্যধর্ম গ্রহণ করল। এসব সংবাদ বাদশাহের কানে পৌঁছলে সে পাদ্রী এবং বালক ও অন্ধকে গ্রেফতার করিয়ে দরবারে আনল। অতঃপর সে পাদ্রী ও অন্ধকে হত্যা করল এবং বালকের ব্যাপারে আদেশ দিল যে, তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু যারা তাকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল তারাই নিচে পড়ে গিয়ে নিহত হল এবং বালক নিরাপদে

ফিরে এল। অতঃপর বাদশাহ্ তাকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করার আদেশ দিল। সে এবারও বেঁচে গেল এবং যারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা সলিলসমাধি লাভ করল। অতঃপর বালকটি স্বয়ং বাদশাহ্কে বলল ঃ বিস্মিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ করলে আমি মারা যাব। সেমতে তাই করা হল এবং বালকটি মারা গেল। এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখে অকস্মাৎ সাধারণ মানুষের মুখে উচ্চারিত হল ঃ আমরা সবাই আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। বাদশাহ্ খুবই অস্থির হল এবং সভাসদদের পরামর্শক্রমে বিরাট বিরাট গর্ত খনন করিয়ে সেগুলো অগ্নিতে ভর্তি করে ঘোষণা দিল ঃ যারা নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। সেমতে বহু লোক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হল। এরপর বাদশাহ্ ও তার সভাসদদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হওয়ার বর্ণনা শপথ সহকারে এই সূরায় আছে।

শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের) এবং শপথ উপস্থিত দিনের এবং শপথ সেদিনের যাতে লোকেরা উপস্থিত হবে। (তিরমিযীর হাদীসে আছে يوم موعود কিয়ামতের দিন شهود শুক্রবার দিন এবং مشهود আরাফাতের দিন। এক দিনকে شاهد এবং এক দিনকে مشهود বলার কারণ সম্ভবত এই যে, শুক্রবার দিন সব মানুষ নিজ নিজ জায়গায় থাকে। তাই দিনটি যেন নিজেই উপস্থিত এবং আরাফাতের দিন হাজীগণ নিজ নিজ জায়গা থেকে সফর করে আরাফাতের ময়দানে এই দিনের উদ্দেশ্যে আগমন করে। তাই দিন যেন উদ্দিষ্ট এবং উপস্থিতির কাল এবং লোকেরা উপস্থিত। শপথের জওয়াব এই ঃ) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নি সংযোগকারীরা যখন তারা সেই অগ্নির আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা ঈমানদারদের সাথে যে জুলুম করছিল, তা দেখে যাচ্ছিল। (বলা বাহুল্য, তাদের অভিশপ্ত হওয়ার সংবাদে মু'মিনগণ আশ্বস্ত হবে। কারণ, এতে বোঝা যায় যে, বর্তমানে যেসব কাফির মুসলমানদের উপর জুলুম করেছে, তারাও অভিশপ্ত হবে। এর প্রতিক্রিয়া দুনিয়াতেও প্রকাশ পেতে পারে। যেমন বদর যুদ্ধে জালিমরা নিহত ও লাঞ্ছিত হয়েছে কিংবা শুধু পরকালে প্রকাশ পাবে, যেমন সাধারণ কাফিরদের জন্য এটা নিশ্চিত। তারা জুলুমের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল। شاهد শব্দের মধ্যে তত্ত্বাবধান ছাড়াও তাদের নিষ্ঠুরতার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। দেখে শুনেও তাদের মনে দয়ার উপক্রম হত না। অভিশপ্ত হওয়ার ব্যাপারে এ বিষয়টির বিশেষ প্রভাব আছে)। কাফিররা মু'মিনদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করেছিল, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসিত, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্বের মালিক। (অর্থাৎ ঈমান আনার অপরাধে এই ব্যবহার করেছে। ঈমান আনা আসলে কোন অপরাধ নয়। সুতরাং নিরপরাধ লোকদের উপর তারা জুলুম করেছে। তাই তারা অভিশপ্ত হয়েছে। অতঃপর জালিমদের জন্য সাধারণ শাস্তিবাণী এবং মজলুমদের জন্য সাধারণ ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফ। (মজলুমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে সাহায্য করবেন এবং জালিমের অবস্থাও জানেন, তাই তাকে শাস্তি দিবেন ইহকালে অথবা পরকালে) যারা মুসলমান নর ও নারীদেরকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি,

তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি; আর (জাহান্নামের বিশেষভাবে) তাদের জন্য আছে দহন যন্ত্রণা। (আযাবে সর্প, বিচ্ছু, বেড়ী, শিকল, ফুটন্ত পানি, পুঁজ ইত্যাদি সবরকম কষ্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সর্বোপরি দহন যন্ত্রণা আছে। তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মজলুমসহ মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। এটা মহাসাফল্য। আপনার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। (কাজেই বোঝা যায় যে, তিনি কাফিরদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন)। তিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় কিয়ামতেও সৃষ্টি করবেন। (সুতরাং পাকড়াওয়ের সময় যে কিয়ামত, তা সংঘটিত না হওয়ার সন্দেহ রইল না)। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের অধিপতি ও মহান। (সুতরাং মু'মিনদের গোনাহ্ মাফ করে দিবেন এবং তাদেরকে প্রিয় করে নিবেন। আরশের অধিপতি হওয়া ও মহত্ত্ব থেকে আযাব দেওয়া এবং সওয়াব দেওয়া উভয়টি বোঝা যায় কিন্তু এখানে মুকাবিলার ইঙ্গিতে একথা বোঝানোই উদ্দেশ্য যে, তিনি সওয়াব দিতে সক্ষম। অতঃপর আযাবদান ও সওয়াবদান উভয়টি প্রমাণ করার জন্য একটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে) তিনি যা চান, তাই করেন। (অতঃপর মু'মিনদেরকে আরও সান্ত্বনা এবং কাফিরদেরকে আরও হুঁশিয়ার করার জন্য কতক বিশেষ অভিশপ্তের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে) আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি অর্থাৎ ফিরাউন (ও ফিরাউন বংশধর) এবং সামূদের? (তারা কিভাবে কুফর করেছে এবং কিভাবে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে? এতে মু'মিনদের আশ্বস্ত এবং কাফিরদের ভীত হওয়া উচিত। কিন্তু কাফিররা মোটেই ভীত হয় না) বরং তারা (কোরআনের) মিথ্যারোপে রত আছে। (পরিণামে তারা এর শাস্তি ভোগ করবে। কেননা) আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (অতঃপর তার কুদরত ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। তারা যে কোরআনকে মিথ্যারোপ করে এটা এক নির্বুদ্ধিতা। কেননা, কোরআন মিথ্যারোপের যোগ্য নয়) বরং এটা মহান কোরআন—লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ। (এতে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সেখান থেকে কড়া প্রহরাধীনে পয়গম্বরের কাছে পৌঁছানো হয়; যেমন সূরা জিনে আছে— فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا —সুতরাং কোরআনকে মিথ্যারোপ করা নিঃসন্দেহে মূর্খতা ও শাস্তির কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ—بروج শব্দটি برج-এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ —এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূল ধাতু برج—এর আভিধানিক অর্থ যাহির হওয়া।

وَلَا تَبَرَّجْنَ-এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে تبرج

تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ—অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بروج-এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশ-মণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে برج—বলা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব برج -এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব برج—এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে ঃ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ—এক্ষণে فلك -এর অর্থ আকাশ নয় বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ——তফসীরের সার-সংক্ষেপে তিরমিযীর হাদীসের বরাত দিয়ে লিখিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, شاهد -এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مشهود -এর অর্থ আরাফাতের দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। এক. বুরূজবিশিষ্ট আকাশের, দুই. কিয়ামত দিবসের, তিন শুক্রবারের এবং চার আরাফাতের দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফিরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মু'মিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

গর্তওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ ঃ এই ঘটনাই সূরা অবতরণের কারণ। তফসীরের সার-সংক্ষেপে ঘটনাটির সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে অতীন্দ্রিয়বাদীর পরিবর্তে যাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ্ ছিল ইয়ামেন দেশের বাদশাহ্। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ যুনওয়াস'। তার সময় ছিল রসূলে করীম (সা)-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। যে বালককে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা যাদুকরের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ আদেশ

করেছিল, তার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে তামের। পাদ্রী খৃস্টধর্মের আবেদ ও যাহেদ ছিল। তখন খৃস্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্রী তখনকার খাঁটি মুসলমান ছিল। বালকটি পথিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেয়ে তার কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত হত এবং অবেশেষে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। ফলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত। ফলে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা যাদুকরের কাছে বিলম্বে পেঁছার কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে গৃহে পেঁৗছাতে বিলম্ব হত এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোন কিছুর পরোয়া না করে পাদ্রীর কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল। এরই বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্বোল্লিখিত কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল ঃ ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হল না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই পছন্দ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে সামান্য ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল ঃ আম্মা, সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন। এই প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোন কোন রেওয়ায়েতে বার হাজার এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বেশী বর্ণিত আছে।

বালক নিজেই বাদশাহ্কে বলেছিল ঃ আপনি আমার তূন থেকে একটি তীর নিন এবং 'বিসমিল্লাহি রব্বী' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। এ পদ্ধতিতে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশাহ্র গোটা সম্প্রদায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফির বাদশাহ্কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই বালকের সমাধি ছিল, ঘটনাক্রমে কোন প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে খনন করানো হলে তার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়। লাশটি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং হাত কোমরদেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহের তীর সেখানেই লেগেছিল। কোন একজন দর্শক তার হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে اللّٰه ربى (আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গভর্নর খলীফা হযরত উমর (রা)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠালেন ঃ তাকে আংটিসহ পূর্বাবস্থায় রেখে দাও।- (ইবনে কাসীর)

ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা দুনিয়াতে একটি নয়—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর

ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন—এক. ইয়ামেনের অগ্নি-কুণ্ড, যার ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্মের সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, দুই. সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন. পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরায় বর্ণিত অগ্নিকুণ্ড আরবের ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজরানে ছিল।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ——এখানে অত্যাচারী কাফিরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে—এক وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, দুই. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ অর্থাৎ তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের রূহ্ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ্ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে।—(মাযহারী)

কাফিরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেওয়ার সাথে সাথে কোরআন বলেছে ঃ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا——অর্থাৎ এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ বাস্তবিকই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপার কোন পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহ্র ওলীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন।—(ইবনে কাসীর)

سورة الطارق

সূরা তারেক

মক্কায় অবতীর্ণঃ ১৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ اِنْ كُلُّ
نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ
دَافِقٍ ۝٦ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٧ اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝٨
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝١٠ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١
وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢ اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤ اِنَّهُمْ
يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝١٥ وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর! (২) আপনি জানেন যে রাত্রিতে আসে, সে কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। (৬) সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। (৭) এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপঞ্জরের মধ্য থেকে (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম! (৯) যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্রশীল আকাশের (১২) এবং বিদারনশীল পৃথিবীর! (১৩) নিশ্চয় কোরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা (১৪) এবং এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে; (১৬) আর আমিও কৌশল করি। (১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আকাশের এবং সেই বস্তুর, যা রাত্রিতে আবির্ভূত হয়। আপনি জানেন

রাত্রিতে কি আবির্ভূত হয় ? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) প্রত্যেকের উপর একজন কর্মসংরক্ষণকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে; (যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

উদ্দেশ্য এই যে, কাজকর্মের হিসাব হবে। উদ্দেশ্যের সাথে শপথের মিল এই যে, আকাশে নক্ষত্র যেমন সর্বদা সংরক্ষিত থাকে এবং বিশেষ করে রাত্রিতে প্রকাশ পায় তেমনিভাবে কাজকর্ম আমলনামায় সব সময় সংরক্ষিত আছে এবং বিশেষ করে কিয়ামতের দিন তা প্রকাশ পাবে)। অতএব মানুষ দেখুক কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের (অর্থাৎ সমগ্র দেহের) মধ্য থেকে নির্গত হয়। (এখানে পানি বলে বীর্য বোঝানো হয়েছে—শুধু পুরুষের কিংবা নারী-পুরুষ উভয়ের। পুরুষের তুলনায় কম হলেও নারীর বীর্যও সবেগে স্খলিত হয়। পানির অর্থ নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য হলে ماء শব্দটি একবচনে আনার কারণ এই যে, উভয়ের বীর্য মিশ্রিত হয়ে এক বস্তুর মত হয়ে যায়। পৃষ্ঠ ও বক্ষ দেহের দুই পার্শ্ব। তাই সমগ্র দেহ অর্থ নেওয়া যায়। সারকথা এই যে, বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করা পুনর্বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক কাজ। তিনি যখন এটাই করতে সক্ষম, তখন প্রমাণিত হল যে) তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। (সুতরাং কিয়ামত না হওয়ার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এই পুনঃ সৃষ্টি সেদিন হবে, যেদিন সবার ভেদ প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্থাৎ বাতিল বিশ্বাস ও ভ্রান্ত নিয়ত ইত্যাদি সব গোপন বিষয় বাহির হয়ে যাবে। দুনিয়াতে যেমন সময়মত অপরাধ অস্বীকার করা এবং তা গোপনে করা হয়, সেখানে এরূপ সম্ভবপর হবে না)। তখন তার কোন প্রতিরোধ শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারী হবে না (যে, আযাব হটিয়ে দিবে। কিয়ামতের বাস্তবতা যেহেতু কোরআন দ্বারা প্রমাণিত, তাই অতঃপর কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) শপথ আকাশের যা থেকে পরপর বৃষ্টিপাত হয় এবং পৃথিবীর, যা (বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়) বিদীর্ণ হয়। (অতঃপর শপথের জওয়াব আছে—) নিশ্চয় কোরআন সত্যমিথ্যার ফয়সালা। এটা আমার কালাম নয়। (এতে কোরআন যে আল্লাহ্‌র সত্য কালাম, একথা প্রমাণিত হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের অবস্থা এই যে,) তারা (সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য) নানা অপকৌশল করছে এবং আমি (তাদেরকে ব্যর্থ ও দণ্ড দেওয়ার জন্য) নানা কৌশল করে যাচ্ছি। (বলা বাহুল্য, আমার কৌশল প্রবল হবে। আপনি যখন আমার কৌশলের কথা শুনলেন) অতএব আপনি কাফিরদেরকে (ভয় করবেন না এবং তাদের দ্রুত আযাব কামনা করবেন না; বরং তাদেরকে) অবকাশ দিন (বেশীদিন নয় বরং) তাদেরকে অবকাশ দিন কিছু দিনের জন্য। (এরপর মৃত্যুর আগে অথবা পরে আমি তাদের উপর আযাব নাযিল করব। শেষ শপথের শেষ বিষয়বস্তুর সাথে মিল এই যে, কোরআন আকাশ থেকে আসে এবং যার মধ্যে যোগ্যতা থাকে, তাকে ধন্য করে। যেমন বৃষ্টি আকাশ থেকে নেমে উর্বর ভূমিকে সমৃদ্ধ করে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেনঃ প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ্র কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কিয়ামতের চিন্তা থেকে গাফিল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অণু, কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কেন আযাব আসে না—কাফিরদের এই প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طارق শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্য নক্ষত্রকে طارق বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জওয়াব দিয়েছে اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ—অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন নক্ষত্রকে বুঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষত্র 'সুরাইয়া', যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সুরাইয়া ও শনিগ্রহকে نجم বলা হয়ে থাকে।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ—এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حافظ শব্দ এক বচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছেঃ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

حافظ-এর অপর অর্থ আপদবিপদ থেকে হিফাযতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হিফাযতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিনরাত মানুষের হিফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হিফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে

বর্ণিত হয়েছে ঃ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

অর্থাৎ মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিফাযত করে।

এক হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন—প্রত্যেক মু'মিনের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হিফাযতের জন্য তিনশ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হিফাযত করে। তন্মধ্যে সাতজন ফেরেশতা কেবল চোখের হিফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়—এমন প্রত্যেক বালা-মুসিবত থেকে এভাবে মানুষের হিফাযত করে, যেমন মধুর পাত্রে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত।—(কুরতুবী)

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ—অর্থাৎ মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তফসীর-বিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিশুদ্ধ হলে তফসীরবিদগণের উপরোক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্তর নয়। কেননা, চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্য উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মস্তিষ্কের। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অণ্ডকোষে পৌঁছেছে। এরই কিছু উপশিরা বক্ষের অস্থি-পাঁজরে এসেছে। এটা সম্ভবপর যে, নারীর বীর্যে বক্ষপাঁজর থেকে আগত বীর্যের এবং পুরুষের বীর্যে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্যের প্রভাব বেশী।—(বায়যাভী)

কোরআন পাকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোন বিশেষত্ব নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বীর্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অঙ্গের নাম উল্লেখ করে সমস্ত দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠ প্রধান অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হওয়া। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

رجع —اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ -এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম।

تبلى—يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না, এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভালমন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে।—(কুরতুবী)

رجع—وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ-এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ—অর্থাৎ কোরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত আলী (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছিঃ

كتاب فيه خبر ما قبلكم و حكم ما بعدكم وهو الفصل ليس با الهزل

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।

سورۃ الاعلی

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণঃ ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣ وَالَّذِيْ
اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦ اِلَّا مَا
شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ
اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝٩ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١٠ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١١
الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٢ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٣ قَدْ اَفْلَحَ
مَنْ تَزَكّٰى ۝١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٥ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٦ وَالْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝١٧ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٨ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝١٩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না— (৭) আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) আমি আপনার জন্য সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (১৬) বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, (১৭) অথচ পরকালের

জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে; (১৯) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে পয়গম্বর) আপনি (এবং যারা আপনার সঙ্গে রয়েছে, সবাই) আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, যিনি (যাবতীয় বস্তুনিচয়কে) সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন (অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু উপযুক্তরূপে সৃষ্টি করেছেন) এবং যিনি (প্রাণীদের জন্য তাদের উপযুক্ত বস্তু) নির্ণয় করেছেন, অতঃপর (তাদেরকে সেসব বস্তুর দিকে) পথ প্রদর্শন করেছেন (অর্থাৎ তাদের মনে সেসব বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন) এবং যিনি (সবুজ সদৃশ) তৃণাদি (মাটি থেকে) উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (প্রথমে সাধারণ সৃষ্টিকর্ম, প্রাণী সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম ও উদ্ভিদ সম্পর্কিত সৃষ্টিকর্ম উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, আনুগত্যের মাধ্যমে পরকালের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। সেখানে কাজকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি হবে। এই আনুগত্যের পন্থা বলার জন্যই আমি কোরআন নাযিল করেছি এবং আপনাকে তা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছি। অতএব এই কোরআন সম্পর্কে আমার প্রতিশ্রুতি এই যে) আমি (যতটুকু) কোরআন (নাযিল করব, ততটুকু) আপনাকে পাঠ করাতে থাকব (অর্থাৎ মুখস্থ করিয়ে দিব) ফলে আপনি (তার কোন অংশ) বিস্মৃত হবেন না আল্লাহ্ যতটুকু (বিস্মৃত করতে) চান, ততটুকু ব্যতীত। (কারণ, এটাও রহিত করার এক পন্থা। আল্লাহ্ বলেন ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এরূপ অংশ আপনার সবার মন থেকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে। এই মুখস্থ করানো ও বিস্মৃত করানো সবই রহস্যোপযোগী হবে। কেননা) তিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় জানেন। (তাই কোনকিছুর উপযোগিতা তাঁর কাছে গোপন নয়। যখন যে বিষয়কে সংরক্ষিত রাখা উপযুক্ত মনে করেন, সংরক্ষিত রাখেন এবং যখন বিস্মৃত করা উপযুক্ত মনে করেন, বিস্মৃত করে দেন। আমি যেমন আপনার জন্য কোরআনকে সহজ করে দেব, তেমনি) আমি আপনাকে সহজ শরীয়তের জন্য (অর্থাৎ শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী চলার জন্য) সুবিধা দান করব। (অর্থাৎ সহজে বোঝাতে পারবেন, সহজে আমল করতে পারবেন এবং সহজে প্রচার করতে পারবেন। সকল বাধাবিপত্তি অপসারিত করে দেব। শরীয়তকে প্রশংসার্থে সহজ বলা হয়েছে অথবা এ কারণে যে, এটা সহজ হওয়ার কারণ। ওহী সম্পর্কিত প্রত্যেক কাজ যখন সহজ করার ওয়াদা আমি করছি, তখন) আপনি (নিজে যেমন পবিত্রতা বর্ণনা করেন তেমনি অপরকেও) উপদেশ দিন যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। (বলা বাহুল্য, উপদেশ উপকারীই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى — কাজেই আপনি সযত্নে উপদেশ দিন। এতদসত্ত্বেও উপদেশ সবার জন্যই উপকারী নয়;

বরং) উপদেশ সে ব্যক্তি গ্রহণ করে, যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। (পক্ষান্তরে) যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করে। (ফলে) সে (অবশেষে) মহা অগ্নিতে (অর্থাৎ জাহান্নামে) প্রবেশ করবে; অতঃপর সেখানে সে মরবেও না এবং (সুখে) জীবিতও থাকবে না। (অর্থাৎ যেখানে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্যতা নেই, সেখানে উপদেশ ব্যর্থ হলেও উপদেশ স্বততই উপকারী বটে। উপদেশ দান আপনার দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এ পর্যন্ত সারমর্ম এই যে, আপনি নিজেও পূর্ণতা অর্জন করুন এবং অপরের কাছেও প্রচার করুন। আমি আপনার সহায়। কোরআন শুনে বাতিল বিশ্বাস ও হীন চরিত্র থেকে) সে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করে যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (কিন্তু হে অবিশ্বাসীরা, তোমরা কোরআন শুনে কোরআনকে মান্য কর না এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ কর না; বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকাল দুনিয়া অপেক্ষা) উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (এই বিষয়টি কেবল কোরআনেরই দাবী নয় বরং) এটা (অর্থাৎ এই বিষয়টি) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও (লিখিত) রয়েছে অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসা (আ)-র কিতাবসমূহে।—[রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দশটি সহীফা এবং মূসা (আ)-র প্রতি তওরাত অবতরণের পূর্বে দশটি সহীফা তথা ছোট কিতাব নাযিল হয়েছিল]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ আলিমগণ বলেন ঃ নামাযের বাইরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى তিলাওয়াত করলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কিরাম এই সূরা তিলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন।—(কুরতুবী)

o ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আ'লা নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ—অর্থাৎ তোমরা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى কালেমাটি সিজদায় পাঠ কর। تسبيح শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ-এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত

নয়—এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে ডাকা জায়েয নয়।

০ এর অপর অর্থ এই যে. যেসব নাম আল্লাহ্র জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোন মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থী, তাই নাজায়েয। যেমন রহমান, রায্যাক, গাফফার, কুদ্দুস ইত্যাদি।—(কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলাক্রমে আবদুর রহমানকে রহমান, আবদুর রায্যাককে রায্যাক এবং আবদুর গাফ্ফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরূপ বলে এবং যে শুনে উভয়ই গোনাহ্গার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্ দিবারাত্রি অহেতুক হতে থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে اسم-এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তার সত্তা। আরবী ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কোরআন পাকেও اسم শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে কালেমাটি নামাযের সিজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی নয় বরং سُبْحَانَ اسْمَ رَبِّکَ الْاَعْلٰی

—এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয় বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। —(কুরতুবী)

বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য ঃ الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰی وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی

—এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহ্র অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলী। প্রথম গুণ خلق-এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোন সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতই কোন পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فَسَوّٰی এটা تسویۃ থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অংগসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক স্প্রিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়গুণ قَدَّرَ—تقدیر-এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি

করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্র ফয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়---সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আকাশ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায়ঃ ابرو باد و مه خورشید و فلک رکادرند ---মাওলানা রুমী বলেছেনঃ

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند
با من و تو مردہ با حق زندہ اند

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ্ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছেঃ

هر یکے را بهر کارے ساختند
میل اورا در دلش انداختند

চতুর্থ গুণ فَهَدٰى---অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছেঃ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বুদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণী বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ

দিন, বনের হিংস্র-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন—প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রষ্টার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোন স্কুল-কলেজ থেকে কিংবা কোন ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহ্‌র পথনির্দেশেরই ফলশ্রুতি যা أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ

ثُمَّ هَدَىٰ ---এবং এই সূরার قَدَّرَ فَهَدَىٰ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র দান ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়েছে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগর গর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে পারে। এ জ্ঞান ও নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ্ তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোন বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহ্‌র সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ্ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কোরআনের একটি মাত্র শব্দ فَهَدَىٰ -এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ —مرعى শব্দের অর্থ পশু-চারণ ভূমি এবং غثاء-শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে।

احوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ্ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আ) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَنْسٰٓى اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ—অর্থাৎ আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাযিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ (সা) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ আমি কোন আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ-এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপযোগিতা বশত কোন আয়াত সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى—এর আক্ষরিক তর্জমা এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এরূপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى—পরবর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহ্ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى—زكوة-এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে تزكى-শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى—অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামায আদায় করে। বাহ্যত এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও এতে শামিল। بَلْ تُؤْثِرُوْنَ

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا—হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর

প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্র কিতাবও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার বৃহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ্, কাল সে পথের ভিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট—দুনিয়ার কোন নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপরি তা اَبْقٰى অর্থাৎ চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয়—তোমার সামনে দু'টি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য—এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায় থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিম্নস্তরেরও হত, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মুকাবিলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى—অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর সহীফাসমূহে। হযরত মূসা (আ)-কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু ঃ হযরত আবূযর গিফারী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ হে ভুঁইফোঁড় গর্বিত বাদশাহ্, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য

স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌঁছতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফিরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহ্‌র মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

আরও বলা হয়েছে ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহবার হিফাযত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

মূসা (আ)-র সহীফার বিষয়বস্তু ঃ হযরত আবূযর (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি মূসা (আ)-র সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ ঃ

আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবূযর (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম ঃ এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেন ঃ হে আবূযর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর— قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ——(কুরতুবী)

سورة الغاشية

সূরা গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২৬ আয়াত ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣
تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ
ضَرِيْعٍ ۝٦ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨
لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝١١ فِيْهَا عَيْنٌ
جَارِيَةٌ ۝١٢ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝١٣ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝١٤ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ
۝١٥ وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝١٦ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧ وَاِلَى
السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝١٨ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝١٩ وَاِلَى الْاَرْضِ
كَيْفَ سُطِحَتْ ۝٢٠ فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝٢١ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝٢٢
اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝٢٣ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝٢٤ اِنَّ
اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝٢٦

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? (২) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত, (৩) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্য কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না। (৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব. (৯) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (১০) তারা

থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে (১১) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরনা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। (১৭) তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফির হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন। (২৫) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কাছে সব কিছুকে আচ্ছন্নকারী সে ঘটনার কিছু সংবাদ পৌঁছেছে কি? (অর্থাৎ কিয়ামতের। তার প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বকে গ্রাস করবে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য, পরবর্তী কথা শোনার আগ্রহ সৃষ্টি করা। অতঃপর জওয়াবের আকারে সংবাদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে)। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন লাঞ্ছিত, ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত হবে। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের কোন খাদ্য থাকবে না, যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। (অর্থাৎ তাতে খাদ্য হওয়ার এবং ক্ষুধা দূর করার যোগ্যতা নেই। ক্লিষ্ট হওয়ার অর্থ হাশরে অস্থির হয়ে ঘোরাফেরা করা, জাহান্নামে শিকল ও বেড়ী টানা এবং পাহাড়-পর্বতে আরোহণ করা। ফুটন্ত ঝরনাকেই অন্য আয়াতে حَمِيم বলা হয়েছে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, জাহান্নামে ফুটন্ত পানিরও ঝরনা হবে। যরী ব্যতীত খাদ্য হবে না। এর অর্থ সুস্বাদু খাদ্য হবে না। সুতরাং যাক্কুম, গিসলীন ইত্যাদি খাদ্য থাকা এর পরিপন্থী নয়। মুখমণ্ডল বলে ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে। অতঃপর জাহান্নামী-দের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছেঃ) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উজ্জ্বল এবং তাদের সৎ কর্মের কারণে প্রফুল্ল হবে। তারা সুউচ্চ জান্নাতে থাকবে। তথায় তারা কোন অসার কথা শুনবে না। তথায় প্রবাহিত ঝরনা থাকবে। জান্নাতে উচ্চ উচ্চ আসন বিছানো আছে এবং রক্ষিত পানপাত্র আছে। (অর্থাৎ এসব সাজ-সরঞ্জাম সামনেই উপস্থিত থাকবে, যাতে পাওয়ার ইচ্ছা হলে পেতে দেরী না হয়)। সারি সারি গালিচা আছে এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট আছে। (ফলে যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই আরাম করতে পারবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতেও হবে না। এসব বিষয়বস্তু শুনে যারা কিয়ামত অস্বীকার করে তারা ভুল করে। কেননা) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃজিত হয়েছে (এর আকৃতি ও স্বভাব অন্যান্য জীবজন্তুর তুলনায় আশ্চর্যজনক) এবং আকাশের দিকে যে কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে এবং পাহাড়ের দিকে যে কিভাবে

তা স্থাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর দিকে যে কিভাবে তা বিছানো হয়েছে? (অর্থাৎ এসব বস্তু দেখে আল্লাহ্‌র কুদরত বোঝে না কেন যাতে কিয়ামতের ব্যাপারে তাঁর সক্ষমতাও বুঝতে পারত। বিশেষভাবে এই চারটি বস্তু উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা প্রায়ই প্রান্তরে চলাফেরা করত। তখন তাদের সামনে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূমি এবং চারদিকে পাহাড়-পর্বত থাকত। তাই এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। প্রমাণাদি দেখা সত্ত্বেও তারা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের চিন্তায় পড়বেন না। বরং) উপদেশ দিন। কেননা আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন---(যে, বেশী চিন্তা করতে হবে)। কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফর করে, আল্লাহ্ তাকে পরকালে মহাশাস্তি দেবেন। কেননা, আমারই কাছে তাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশও আমারই কাজ। (কাজেই আপনি অধিক চিন্তিত হবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ---কিয়ামতে মু'মিন ও কাফির আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফিরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خَاشِعَةٌ অর্থাৎ হেয় হবে। خشوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাযে খুশুর অর্থ আল্লাহ্‌র সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ---বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عاملة এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় ناصبة। বলা বাহুল্য, কাফিরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন ঃ প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফিরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফির দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খৃস্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) যখন

শাম দেশে সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খৃস্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত উমর (রা) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ---আয়াত তিলাওয়াত করলেন।---(কুরতুবী)

حَامِيَةً—نَارًا حَامِيَةً শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ---অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোন খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারেকাছেও যায় না।

জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে? এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঘাস-বৃক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহান্নামে এগুলো কিরূপে থাকবে? জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা লালন করেছেন। তিনি জাহান্নামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম; ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলন্ত হবে।

কোরআনে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্কুম ও গিস্লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা কোন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মত কষ্টদায়ক বস্তু খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্কুম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেনঃ সম্ভবত জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাদ্য হবে---কোথাও যরী, কোথাও যাক্কুম এবং কোথাও গিসলীন।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ---জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী---একথা শুনে কোন কোন কাফির বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়ে যায়। এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার

চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটাতাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً——অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا تَاثِيمًا——অর্থাৎ তারা জান্নাতে কোন অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতিনীতি ঃ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ —وَأَكْوَابٌ শব্দটি كوب-এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। مَّوْضُوعَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু——যেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে ——একথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ——কিয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফিরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহ্র অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

জন্তুদের মধ্যে উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের

জন্য আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের দর্পণ হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহা-বয়বের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজলভ্য করেছেন যে, আরবের বেদুইন ও দরিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না। কারণ, একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেয়ে চলে আসে। উঁচু বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে দেওয়ার কষ্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই বৃক্ষের ডাল খেয়ে খেয়ে দিনাতি-পাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুর্মূল্য খাবার দিতে হয় না। আরবের প্রান্তরে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা উটের পেটে একটি রিজার্ভ টাংকী স্থাপন করেছেন। সে সাত-আট দিনের পানি একবারে পান করে এক টাংকীতে ভরে নেয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ভ পানি ব্যয় করে। এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিঁড়ির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার পা তিন ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে হাঁটু রেখেছেন। সে যখন সবগুলো হাঁটু গেড়ে বসে যায়, তখন তার পিঠে সওয়ার হওয়া ও নামা খুব সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিশ্রমী যে, সব জীবের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌদ্রতাপের কারণে দিবাভাগে সফর করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা এই জীবকে সারারাত্রি সফরে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকারশি ধরে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আল্লাহ্র কুদরতের সবক দেয় এমন আরও বহু বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। সূরার উপসংহারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে ঃ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ——অর্থাৎ আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মু'মিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

سورۃ الفجر

সূরা ফজর

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৩০ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ
قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧
الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝١١ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝١٢
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝١٣ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝١٤ فَاَمَّا
الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝١٥
وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۝١٦ كَلَّا بَلْ
لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝١٧ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝١٨ وَتَاْكُلُوْنَ
التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝١٩ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝٢٠ كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا
دَكًّا ۝٢١ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ
يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۝٢٣ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ۝٢٤
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٥ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۝٢٦ يٰٓاَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝٢٧ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝٢٨ فَادْخُلِيْ فِيْ
عِبٰدِيْ ۝٢٩ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝٣٠

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু।

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, (৩) শপথ তার, যা জোড় ও যা বেজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে, (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি (৯) এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল (১০) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে, (১১) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল। (১২) অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (১৫) মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন (১৬) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (১৭) এটা অমূলক বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (১৮) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না (১৯) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (২২) এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে? (২৪) সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! (২৫) সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না (২৬) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (২৭) হে প্রশান্ত মন, (২৮) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (২৯) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ফজরের সময়ের এবং (যিলহজ্জের) দশ রাত্রির (অর্থাৎ দশদিনের। এই দিনগুলোর ফযীলত অনেক)। শপথ তার যা জোড় ও যা বেজোড়। (জোড় বলে যিলহজ্জের দশম তারিখ এবং বেজোড় বলে নবম তারিখ বোঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, এর অর্থ নামায। কোন নামাযের রাক'আত জোড় এবং কোন নামাযের রাক'আত বেজোড়। প্রথম রেওয়ায়েতকে বর্ণনা ও অর্থ উভয় দিক দিয়ে অধিক সহীহ্ বলা হয়েছে। কারণ, এই সূরায় সময়েরই শপথ করা হয়েছে। সুতরাং জোড় ও বেজোড়ও সময়েরই শপথ হওয়া সঙ্গত। এরূপও বলা যায় যে, জোড় ও বেজোড় বলে যা যা সম্মানার্হ, তাই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় সময়ও এর অন্তর্ভুক্ত এবং নামাযের রাক'আতও

দাখিল)। শপথ রাত্রির, যখন তা গত হতে থাকে (যেমন অন্য আয়াতে আছে وَاللَّيْلِ

إِذَا أَدْبَرَ —অতঃপর এই শপথটি যে মহান, মধ্যবর্তী বাক্যে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে)

এর মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট শপথ আছে কি? [এ প্রশ্নের অর্থ আরও জোরদার করা অর্থাৎ উল্লিখিত শপথগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি শপথ বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য যথেষ্ট। কোরআনে উল্লিখিত সব শপথই এ ধরনের কিন্তু গুরুত্ব বোঝাবার জন্য এ শপথের যথেষ্টতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ

لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ শপথের উহ্য জওয়াব এই যে, কাফিরদের অবশ্যই শাস্তি হবে। পরবর্তী শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত থেকে একথা বোঝা যায়।---(জালালাইন)] আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং সারা বিশ্বের শহরসমূহে শক্তি ও বলবীর্যে যাদের সমান কোন লোক সৃজিত হয়নি? [এ সম্প্রদায়ের দুটি উপাধি ছিল আদ ও ইরাম। আ'দ আসের, আস্ ইরামের এবং ইরাম ছিল নূহ-তনয় সামের পুত্র। সুতরাং, কখনও তাদেরকে পিতার নামে আ'দ বলা হয়, আবার কখনও দাদার নামে ইরাম বলা হয়। ইরামের অপর পুত্র ছিল আবের এবং আবেরের পুত্র ছিল সামূদ। এই নামে একটি বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অতএব, আ'দ আসের মধ্যস্থতায় এবং সামূদ আ'বেরের মধ্যস্থতায় ইরামের সাথে মিলিত হয়ে যায়। আয়াতে আ'দের সাথে ইরামকে যুক্ত করার কারণ এই যে, আ'দ বংশের দুটি স্তর রয়েছে—পূর্ববর্তী যাদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয় এবং পরবর্তী, যাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। ইরাম শব্দ যোগ করায় ইঙ্গিত হয়ে গেল যে, এখানে প্রথম আ'দ বোঝানো হয়েছে। কেননা, কম মধ্যস্থতার কারণে ইরাম শব্দের অর্থ প্রথম আ'দই হয়ে থাকে---(রূহুল মা'আনী) অতঃপর অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত উম্মতের কথা বলা হয়েছে যে, আপনি কি লক্ষ্য করেননি]---সামূদ গোত্রের সাথে (কি আচরণ করেছেন) যারা কোরা উপত্যকায় (পাহাড়ের) পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। ('ওয়াদিউল কোরা' তাদের একটি শহরের নাম; যেমন অপর এক শহরের নাম ছিল 'হিজর'। এগুলো সবই হেজায ও শামের মধ্যস্থলে অবস্থিত সামূদ গোত্রের বাসস্থান)। এবং কীলকের অধিপতি ফিরাউনের সাথে।---(দুররে মনসূরে বর্ণিত আছে ফিরাউন যাকে শাস্তি দিত তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিয়ে শাস্তি দিত। অতঃপর সব সম্প্রদায়ের অভিন্ন অপরাধ উল্লেখ করা হয়েছে---) যারা শহরসমূহে গর্বিত মস্তক উঁচু করে রেখেছিল এবং তথায় বিস্তর অশান্তি বিরাজ করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (অর্থাৎ আযাব নাযিল করলেন। এখানে আযাবকে চাবুকের সাথে এবং নাযিল করাকে আঘাত করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর এই শাস্তির

কারণ এবং উপস্থিত কাফিরদের শিক্ষার জন্য ইরশাদ হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (অবাধ্যদের প্রতি) সতর্ক দৃষ্টি রাখেন (ফলে উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলোকে তো ধ্বংস করে দিয়েছেনই এবং বর্তমান লোকদেরকেও আযাব দেবেন)। অতএব (এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আযাব ডেকে আনে, এমন কর্ম থেকে বেঁচে থাকা উচিত ছিল কিন্তু কাফির) মানুষ যে, (যে কর্মই তারা অবলম্বন করে সেগুলোর উৎস দুনিয়াপ্রীতি ; সেমতে তাকে তার পালনকর্তা পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন (যেমন, ধনসম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেন, যার উদ্দেশ্য তার কৃতজ্ঞতা যাচাই করা) তখন সে (একে তার প্রাপ্য বলে মনে করে গর্বে ও অহংকারভরে) বলে, আমার পালনকর্তা আমার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি তাঁর প্রিয়পাত্র বলেই আমাকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন)। এবং যখন তাকে (অন্যভাবে) পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, (যার উদ্দেশ্য তার সবর ও সন্তুষ্টি যাচাই করা) তখন সে (অভিযোগের সুরে) বলে ঃ আমার পালনকর্তা আমার সম্মান হ্রাস করেছেন। (অর্থাৎ আমি সম্মানের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ইদানিং আমাকে হেয় করে রেখেছেন। ফলে পার্থিব নিয়ামতও হ্রাস পেয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কাফির দুনিয়াকেই মূল লক্ষ্য মনে করে। ফলে এর স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রিয়পাত্র হওয়ার প্রমাণ এবং নিজেকে এর যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে এর দুঃখকষ্টকে বিতাড়িত হওয়ার দলীল এবং নিজেকে এর পাত্র নয় বলে মনে করে। সুতরাং কাফির ব্যক্তি দুটি ভুল করে—এক. দুনিয়াকে মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করা। এ থেকে পরকালে অবিশ্বাস জন্মলাভ করে। দুই. যোগ্যপাত্র হওয়ার দাবী করা। এথেকে গর্ব, অহংকার অকৃতজ্ঞতা, বিপদে হতাশা এবং ধৈর্যহীনতা জন্মলাভ করে। এগুলো সব আযাবের কারণ)। কখনই এরূপ নয়। (অর্থাৎ দুনিয়া মূল লক্ষ্য নয় এবং দুনিয়া থাকা না থাকা প্রিয়পাত্র অথবা অপ্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল নয়। কেউ কোন সম্মানের যোগ্য নয় এবং সবর ও কৃতজ্ঞতা ওয়াজিব হওয়ার গণ্ডি থেকে কেউ মুক্ত নয়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কেবল এসব কর্মই আযাবের কারণ নয়) বরং (তোমাদের মধ্যে আরও অনেক কর্ম নিন্দনীয়, অপছন্দনীয় ও আযাবের কারণ রয়েছে। সেমতে) তোমরা এতীমকে সম্মান কর না (অর্থাৎ এতীমকে লাঞ্ছিত কর এবং জুলুম করে তার ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে ফেল) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (অর্থাৎ অপরের প্রাপ্য নিজেরাও পরিশোধ কর না এবং অপরকেও পরিশোধ করতে বল না। বস্তুত ওয়াজিব কাজ না করা কাফিরের জন্য আযাব বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। তবে কুফর ও শিরক আসল আযাবের ভিত্তি হয়ে থাকে)। তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণই কুক্ষিগত করে ফেল। (অর্থাৎ অপরের হকও খেয়ে ফেল। বর্তমান ব্যাখ্যা অনুযায়ী তখন উত্তরাধিকার মক্কায় প্রচলিত না থাকলেও ইবরাহিমী এবং ইসমাঈলী শরীয়তের উত্তরাধিকার প্রথা মক্কায় বিদ্যমান ছিল। সেমতে মূর্খতাযুগে শিশু ও কন্যাদেরকে উত্তরাধিকারের যোগ্য মনে না করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, উত্তরাধিকার প্রথা পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। সূরা নিসায় এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে) এবং তোমরা ধনসম্পদকে খুবই ভালবাস। (উপরোক্ত

কুকর্মসমূহ এরই ফলশ্রুতি। কেননা, দুনিয়াপ্রীতিই সব পাপের মূল কারণ। সারকথা, এসব ক্রিয়াকর্মই শাস্তির কারণ। অতঃপর যারা এসব কর্মকে শাস্তির কারণ মনে করে না, তাদেরকে শাসানো হয়েছে---) কখনও এরূপ নয়। (এসব কর্ম শাস্তির কারণ অবশ্যই হবে। অতঃপর শাস্তি ও প্রতিদানের সময় বর্ণনা করা হয়েছে---) যখন পৃথিবী (অর্থাৎ পৃথিবীর সুউচ্চ অংশ, যথা পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (ফলে ভূপৃষ্ঠ সমান্তরাল হয়ে যাবে, যেমন অন্য আয়াতে আছে لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا) এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে। (হিসাব-নিকাশের সময় এটা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না)। এবং সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ বুঝবে এবং এই বোঝা তার কি কাজে আসবে? (অর্থাৎ এখন বুঝলে তার কোন উপকার হবে না। কারণ, সেটা প্রতিদান জগৎ---কর্মজগৎ নয়)। সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম! সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দেবে না এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দেবে না। (অর্থাৎ এমন কঠোর শাস্তি ও বন্ধন দেবেন, যা দুনিয়াতে কেউ কাউকে দেয়নি। অতঃপর আল্লাহ্র বাধ্য বান্দাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ) হে প্রশান্ত রূহ্, (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যে বিশ্বাসী ছিল এবং কোন প্রকার সন্দেহ ও অস্বীকার করত না। রূহ্ সেরা অঙ্গ, তাই রূহ্ বলে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে)। তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও এমতাবস্থায় যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (مطمئنة শব্দের মাঝে তাদের সৎ কর্মসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সৎকর্মের প্রতি ইঙ্গিত এবং শাস্তির কর্মসমূহের বিবরণ দানের কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে মক্কাবাসীদেরকে শোনানোই প্রধান উদ্দেশ্য। তখন মক্কায় এ জাতীয় কর্মের লোক বেশী ছিল)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়-বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বোঝানো যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাসের এক

রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ্ (রা) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (র) ও ইকরিমা (রা)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নহ্র' তথা যিলহজ্জের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোন রাত্রি নেই। কারণ, এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোন হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌঁছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌঁছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্জ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি---একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নহর' তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী।--(কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ্ এবং মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে এতে যিলহজ্জের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা, হাদীসে এসব রাত্রির ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ইবাদত করার জন্য আল্লাহ্র কাছে যিলহজ্জের দশদিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছর রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য।---(মাযহারী) হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ-এর তফসীর করেছেন, যিলহজ্জের দশদিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত মূসা (আ)-র কাহিনীতে وَاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন ঃ হযরত জাবের (রা)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মূসা (আ)-র জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ---এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বেজোড়'। এই জোড় ও বেজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر---অর্থাৎ وتر-এর অর্থ আরাফা দিবস, (যিলহজ্জের নবম তারিখ) এবং شفع --এর অর্থ ইয়াওমুন্নহ্র (যিলহজ্জের দশম তারিখ)।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেনঃ এটা সনদের দিক দিয়ে এমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ্, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রা) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেনঃ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ——অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি; যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা সত্তার--- هُوَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ——يسرى অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেনঃ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ——حجر -এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حجر -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপথও যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জওয়াব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—এক. আ'দ বংশ, দুই. সামূদ গোত্র এবং তিন. ফিরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে শুধু আ'দ-এর সাথে ইরাম উল্লেখ করার কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ — এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عاد ارم শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজ্‌মে عاد الاولى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ঃ ذَاتِ الْعِمَادِ—عمود ও عماد শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে ذات العماد বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে ঃ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুকাতিল (র) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতদৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذات العماد—কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ—وتد শব্দটি اوتاد-এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফিরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফিরাউন যার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাতপায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে

দিত এবং তার দেহে সর্প, বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফিরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।---(মাযহারী)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ---আ'দ, সামূদ ও ফিরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ---مرصد ও مرصاد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহ্র কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয় ঃ فَأَمَّا الْإِنسَانُ---আয়াতে আসলে কাফির ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়---এক. সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। দুই. আমি আল্লাহ্র কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন ঃ كَلَّا ---অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সৎ ও আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলীল নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবী করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনদিন

মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রসূলে করীম (সা) বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দরিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে।---(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ।---(মাযহারী)

ইয়াতীমের জন্য ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরী ঃ এরপর কাফিরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ—অর্থাৎ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়-ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সন্তানদের মুকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফিররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা ইয়াতীমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল ঃ وَلَا تَحٰٓضُّونَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا—অর্থাৎ তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম ওয়ারিশী সম্পত্তি একত্র করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসম্পদ একত্র করা নাজায়েয কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, ওয়ারিশী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতই তাকিয়ে থাকে, কবে সম্পত্তির মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে ঃ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا—অর্থাৎ তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফিরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا—دك -এর শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ—অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى—تذكر -এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফির মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা পরকাল কর্ম-জগৎ নয়—প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও পাকড়াও-য়ের সময়। আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াওয়ের মত কঠিন পাকড়াও কারও হতে পারে না। অতঃপর মু'মিনদের সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ —এখানে মু'মিনদের রূহকে نفس مطمئنة (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দস্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহ্‌র আনুগত্য, যিকির ও শরীয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ —অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও।

ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখানে থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً —অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহ্‌র ফয়সালার সন্তুষ্ট হওয়ার তওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ

من احب لقاء الله احب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقائه

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারও পছন্দনীয় নয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বললেন ঃ আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক প্রিয় বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফিরের সামনে আযাব ও শাস্তি উপস্থিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোন বিষয় মনে হয় না।—(মাযহারী) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমাত্রই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আত্মা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। راضية مرضية -এর মর্ম তাই।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي---প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ এবং ইউসুফ (আ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ এতে বোঝা গেল, সৎসংসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِي جَنَّتِي---এতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'আমার জান্নাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির স্থান।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ, পূর্বোল্লিখিত কাফিরদের আযাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাসীর বলেছেন ঃ উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে—মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মসনদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اخرجي راضية مرضية الى روح الله وريحان الله অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট---এমতাবস্থায় তুমি এ দেহ থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি

পাঠ করলাম। হযরত আবূ বকর (রা) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন! রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে।---(ইবনে কাসীর)

কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) বলেন ঃ তায়েফ নগরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ইন্তিকাল হয়। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হল যার অনুরূপ পাখী কখনও দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শবাধারে ঢুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ--আয়াতখানি পাঠ করল। সবাই তালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কোন হদিস পাওয়া গেল না।----(ইবনে কাসীর)

ইমাম হাফেয তিবরানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থে ফাত্তান ইবনে রুযাইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাত্তান ইবনে রুযাইন বলেন ঃ একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার বাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফির বাদশাহ্ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদস্তি চালাল। সে বলল ঃ যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হল। সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করল। সেমতে তার গর্দান কেটে মস্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হল। তখন মস্তকটি পানির গভীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপরে ভেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي এরপর মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খৃস্টানরা এ ঘটনা দেখে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্ম-ত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবূ জাফর মনসূর আমা-দেরকে বাদশাহ্র কবল থেকে মুক্ত করে আনেন।---(ইবনে কাসীর)

سورة البلد

সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ২০ আয়াত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿١﴾ وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ﴿٣﴾
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ؕ﴿٤﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ﴿٥﴾
يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ؕ﴿٦﴾ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ؕ﴿٧﴾ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ
عَيْنَيْنِ ۙ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۙ﴿٩﴾ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ﴿١٠﴾ فَلَا اقْتَحَمَ
الْعَقَبَةَ ۖ﴿١١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ؕ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ
ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۙ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ؕ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ
مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ؕ﴿١٧﴾ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ؕ﴿١٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ؕ﴿١٩﴾
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۧ﴿٢٠﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (৩) শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়, (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রম-নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি! (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, (৯) জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়? (১০) বস্তুত আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসমুক্তি

(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান (১৫) এতীম আত্মীয়কে (১৬) অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই (মক্কা) নগরীর শপথ করি এবং [শপথের জওয়াব বলার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য একটি সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে যে] আপনার জন্য এ নগরীতে যুদ্ধবিগ্রহ জায়েয হবে। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জন্য যুদ্ধ হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। হেরেমের বিধানাবলী অপ্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছিল)। শপথ জনকের এবং যা জন্ম দেয় তার। [সমস্ত সন্তানের পিতা আদম (আ)। অতএব এভাবে আদম ও বনী-আদম সবারই শপথ হয়ে গেল। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে] আমি মানুষকে খুব শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি। (সেমতে মানুষ সারা জীবন অসুখে-বিসুখে, কষ্টে ও চিন্তাভাবনায় অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। এর ফলে তার মধ্যে অক্ষমতা ও অপারক মনোভাব থাকা উচিত ছিল। সে নিজেকে বিধি-লিপির বেড়াজালে আবদ্ধ মনে করত এবং আল্লাহ্র আদেশের অনুসারী হত। কিন্তু কাফির মানুষ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে। অতএব) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না ? (অর্থাৎ সে কি নিজেকে আল্লাহ্র কুদরতের বাইরে মনে করেই এমন ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে ?) সে বলে ঃ আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। (অর্থাৎ একে তো স্পর্ধা দেখায়, তার উপর রসূলের শত্রুতা ও ইসলামের বিরোধিতায় ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে গর্বের বিষয় মনে করে। এরপর প্রচুর ধনসম্পদের বলে মিথ্যাও বলে)। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি ? [অর্থাৎ আল্লাহ্ অবশ্যই দেখছেন এবং তিনি জানেন যে, পাপ কাজে ব্যয় করেছে। সুতরাং এজন্য শাস্তি দেবেন। এছাড়া পরিমাণও দেখেছেন যে, প্রচুর নয়। এটা যেকোন কাফিরের অবস্থা। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শত্রুরা তাই বলত এবং করত। মোট কথা, কাফির ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি এবং অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দ্বারাও হয়নি, যা অতঃপর বর্ণিত হয়েছে]। আমি কি তাকে চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় দেইনি ? অতঃপর তাকে ভাল ও মন্দ দু'টি পথই বলে দিয়েছি যাতে ক্ষতি-কর পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং লাভের পথে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতেও আল্লাহ্র বিধানাবলীর অনুসারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (ধর্মের কাজ কষ্টসাধ্য বিধায় একে ঘাঁটি বলা হয়েছে)। আপনি কি জানেন, সে ঘাঁটি কি ? তা হচ্ছে দাস-মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, কোন আত্মীয় এতীমকে অথবা কোন ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে। (অর্থাৎ আল্লাহ্র এসব বিধান মেনে চলা উচিত ছিল)। অতঃপর (সর্বোপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল) যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সব-রের এবং (উপদেশ দেয়) দয়ার। (অর্থাৎ জুলুম না করার। ঈমান সবার অগ্রে, এরপর

সবরের উপদেশ উত্তম, এরপর জুলুম থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, এরপর আসে فَكُّ رَقَبَةٍ থেকে مَتْرَبَةٍ পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াদির স্তর। অতএব ثُمَّ অব্যয়টি এখানে মর্যাদার উচ্চতা বোঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখাগুলো মেনে চলা উচিত ছিল। অতঃপর মু'মিনদের প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে)। তারাই ডান-দিকস্থ লোক। (এর তফসীর সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানেও এ শব্দে সর্বস্তরের মু'মিনই অন্তর্ভুক্ত)। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে (অর্থাৎ শাখা তো দূরের কথা মূলনীতিই মানে না)। তারাই বামপার্শ্বস্থ লোক। তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে ভর্তি করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে চিরকাল সেখানে থাকবে এবং বের হতে পারবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ—এখানে لَا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই لَا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। البلد (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে امين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ এ কথা জ্ঞাপন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা অভিজাত ও সেরা নগরী। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আ'দী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হত, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না।—(মাযহারী)

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ—حل শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে—এক. এটা حلول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেওয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حل-এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র ; বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুই. এটা حلت থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এ দিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফিররা হালাল মনে করে রেখেছে

এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহ্‌র রসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে! অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কার হেরেমে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ---এখানে والد বলে মানব পিতা হযরত আদম (আ) আর ما ولد বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ—كبد-এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে ; জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি---এসমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই।

কোন কোন আলিম বলেন ঃ মানুষের ন্যায় অন্য কোন সৃষ্টজীব কষ্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক-শক্তি অত্যন্ত বেশী। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কষ্ট ও শ্রমনির্ভরশীলরূপেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ আপনাআপনি সৃজিত হয়নি অথবা অন্য কোন মানুষ তাকে জন্ম দেয়নি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানবের কোন প্রভাব থাকত, তবে সে নিজের জন্য কখনও এরূপ শ্রম ও কষ্ট পছন্দ করত না।---(কুরতুবী)

কষ্ট স্বীকারের জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত ঃ এ শপথ ও তার জওয়াবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোন কষ্টের

সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদের এই কামনা একটি দুঃস্বপ্ন, যা কোনদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কষ্ট করতেই হবে, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হল, এমন বিষয়ে কষ্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চয়তা দেবে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঈমান ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসী মানুষের কতিপয় মূর্খতাসুলভ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ——অর্থাৎ এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখছেন।

চক্ষু ও জিহ্‌বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য ঃ — أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ—نجد শব্দটি نجدين-এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এ পথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলারও কোন ক্ষমতা নেই এবং তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করলে আল্লাহ্ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও কুদরত এর মধ্যেই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথমে চক্ষুদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তার অবস্থান ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক অঙ্গ। এর হিফাযতের ব্যবস্থা এর সৃষ্টির পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্দা রাখা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মত কোন ক্ষতিকর বস্তু সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্দার উপরে ধূলোবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম স্থাপন করা হয়েছে। মাথার দিক থেকে পতিত বস্তু যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজন্য ভ্রূর চুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে ভ্রূর শক্ত হাড় এবং নিচে গণ্ডদলের শক্ত হাড় রয়েছে। ফলে মানুষ যদি কোথাও উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমণ্ডলে কোন কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অস্থিদ্বয় চক্ষুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে জিহ্‌বা। এর কারিগরিও বিস্ময়কর। এই রহস্যঘন স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন—মনের মাঝে কোন একটি বিষয়বস্তু উঁকি দিল, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা তৈরী করল। অতঃপর সে ভাষা জিহ্‌বার মেশিন দিয়ে বের হতে লাগল। এই দীর্ঘ কাজটি অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। ফলে শ্রোতা অনুভবও করতে পারে না যে, কতগুলো মেশিনারী কর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্‌বায় এসেছে। জিহ্‌বার কাজে ওষ্ঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওষ্ঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওষ্ঠই আওয়ায ও

অক্ষরকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ, সম্ভবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিহ্বাকে একটি দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ঈমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যায় ক্ষমা করা। এই জিহ্বা দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহ্বার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধ্বংসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ তরবারিকে ওষ্ঠদ্বয়ের চাদর দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওষ্ঠদ্বয়ের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওষ্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওষ্ঠ-দ্বয়ের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল ও মন্দের পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখে-ছেন। যেমন এক আয়াতে আছে فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا অর্থাৎ মানুষের নফসের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়-গম্বরগণ ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অস্তিত্বের কয়েকটি দেদীপ্যমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহ্র কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর।

অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে—এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ্র কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আত্ম-রক্ষা করা, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধ-নের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগা মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই আঁকড়ে রয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ — عقبة বলা হয়

পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে